(পথিকৃৎ পত্রিকার সেপ্টেম্বর ২০০৬ সংখ্যা থেকে নেওয়া)

বন্দেমাতরম প্রশ্নে

সুবর্ণ গুপ্ত

[কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ মন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা অর্জুন সিং হঠাৎ আবিষ্কার করেন যে ১৯০৬ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত এবং আনন্দমঠ উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত বন্দেমাতরম সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অতএব সেই হিসাবে ৭ই সেপ্টেম্বর এই শতবর্ষ পালনের অঙ্গ হিসাবে সমস্ত স্কুলে বন্দেমাতরম গাওয়া হবে। এমনকি শতবর্ষ পালনের জন্য সোনিয়া গান্ধী, অটলবিহারী বাজপেয়ী-সহ এক উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের ঘোষণাও হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম সমাজের মৌলবাদী অংশের মধ্য থেকে এই বলে প্রতিবাদ ওঠে যে বন্দেমাতরম ইসলামবিরোধী, ফলে কোনও মুসলিম স্কুলে এটি গাওয়া চলবে না। হিন্দু মৌলবাদী বিজেপি-আরএসএস সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করে যে বন্দেমাতরম ঐদিন গাইতেই হবে এবং যারা বন্দেমাতরম গাইবে না তারা জাতীয়তাবাদবিরোধী। ফলে একটা পুরনো বিতর্ককে অহেতুক খুঁচিয়ে তোলা হয় এবং তার ভিত্তিতে একটা সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকে নতুনভাবে উস্কানি দেওয়া শুরু হয়। কিছুটা বিপাকে পড়ে অর্জুন সিং প্রথমে বলেন ঐ গান গাওয়ার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। পরে যখন ইতিহাসবিদেরা বন্দেমাতরম সঙ্গীতের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তখন কংগ্রেস কিছুটা কোণঠাসা হয়ে স্বীকার করে যে, এরকম ঘোষণা করা ঠিক হয়নি। নির্লজ্জের মতো অর্জুন সিং বলেন, বিতর্ক নাকি তিনি সৃষ্টি করেননি, সংবাদমাধ্যম এবং অন্য কেউ এর হোতা। অন্যদিকে বিজেপি এই নিয়ে বাজার মাৎ করতে চাইছে এবং কৌশলে মুসলিমবিদ্বেষ সুড়সুড়ি নিয়ে হীন মৌলবাদী প্রচারের আড়ালে ভোটের ফায়দা লুঠতে চাইছে। ১৯৮২ সালে আনন্দমঠ রচনার শতবার্ষিকীতে প্রয়াত সিপিএম নেতা সরোজ মুখার্জী আনন্দমঠকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে অনুরূপ এক বিতর্কের অবতারণা করেন। এবং যথারীতি কংগ্রেস তার বিরোধিতায় আনন্দমঠকে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক হিসাবে বর্ণনা করে যাবতীয় দেশপ্রেম (!) উগরে মহা দেশভক্তির প্রদর্শনে মাতে। সেইসময় আনন্দমঠ রচনার একটি যথাযথ যুগভিত্তিক মূল্যায়ন তুলে ধরতে এবং কংগ্রেস ও ভণ্ড মার্কসবাদীদের যুক্তির অসারতা দেখাতে পথিকৃৎ, ২০ বর্ষ ২ সংখ্যায় আমরা "আনন্দমঠের প্রশ্নে" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করি। বন্দেমাতরমকে কেন্দ্র করে ওঠা সাম্প্রতিক বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধটির প্রাসঙ্গিকতা থাকায় আমরা প্রয়োজনীয় সম্পাদনা ও পরিবর্ধন সহকারে সেটি পুনর্মুদ্রিত করলাম।]

বন্দেমাতরম গান নিয়ে ঝড় একটা উঠেছিলো। সেটা ছিল চব্বিশ বছর আগে। ঝড় তুলেছিলেন প্রয়াত সিপিএম নেতা সরোজ মুখার্জী। "বন্দেমাতরম" গানের শতবর্ষকে ঘিরে আবার বইছে জোরালো বাতাস। এমন ঝড় ওঠে অনেক সময়ই অনেক বিষয়কে কেন্দ্র করে। সব বিষয়ই সমান গুরুত্ব পাবার মতো নয়। তবে বন্দেমাতরম গান এবং সেই অর্থে আনন্দমঠকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কটা তোলার চেষ্টা হয়েছে তাতে আলোর বদলে উত্তাপ বেশি হলেও বিষয়টা যথেষ্ট ভাববার মতো। কারণ এই বিতর্কের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের দেশের রেনেসাঁস আন্দোলন এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সম্বন্ধে যথাযথ উপলব্ধি গড়ে ওঠার প্রশ্নটি। এবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন সিং, তাঁর গণনা মতো শতবর্ষপূর্তি দিবসে সমস্ত দেশের বিদ্যালয়ে বন্দেমাতরম গাওয়া বাধ্যতামূলক করার কথা বলে বিতর্ক উস্কে তুলেছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু প্রতিনিধি এতে আপত্তি করেছেন। সেই সুযোগে হিন্দুত্ববাদীর দল "বন্দেমাতরম"-এর পক্ষে ত্রিশূল বাগিয়েছে। এর আগে বন্দেমাতরম গানটির শতবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের অংশগ্রহণ করাকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান সিপিএম নেতা প্রয়াত সরোজ মুখার্জী খানিকটা আচমকাই বলেছিলেন যে আনন্দমঠে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। কাজেই হিন্দু-

মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষা করার প্রয়োজনে এবং জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে এ জাতীয় রচনার শতবর্ষ পালনের কোনও ঘটনাকে বামফ্রন্ট সমর্থন করতে পারে না। 'আনন্দমঠ'-এর অপমান মানে জাতীয় ঐতিহ্যকে অপমান করা, এ চলতে পারে না, বলে সেদিন সরোজ মুখার্জীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের কংগ্রেস মন্ত্রী প্রণব মুখার্জী থেকে শুরু করে অনেকেই রোষে ফুলতে থাকেন। কেউ কেউ আবার বিক্ষোভ জানানোরও চেষ্টা করেছিলেন। একটি বিশেষ মহল থেকে বলার চেষ্টা হয় যে, কমিউনিস্টরা চিরকালই দেশের প্রাচীনত্ব, গৌরবময় অতীতকে অশ্রদ্ধা করে থাকে। আবার কেউ কেউ বললেন, না, উনি ঠিক বলেছেন। ওনার এই বক্তব্যে ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে তাই প্রতিক্রিয়াশীল মহল খেপে গিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করছে। মুশকিলটা হলো যে, এই তর্জন গর্জনের সারবত্তা যাই হোক না কেন, মানুষ কিন্তু তাতে কিছুটা বিভ্রান্ত হন এবং শিক্ষিত সমাজের একটা বিশেষ অংশ যারা জাতীয় সভ্যতা কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠাবান তাঁরা কমিউনিস্ট মতাদর্শ এবং বিচারপদ্ধতির প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হয়ে উঠেছেন। এখন আবার সিপিএমের সমর্থনে গদিতে বসে থাকা কংগ্রেসের মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের কথা হিন্দুত্ববাদীদের সঙ্গে সমধর্মী দেখাচ্ছে।

যুগভিত্তিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা

তাই যাঁরা যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিচার করতে আগ্রহী, যাঁরা চান যে উত্থাপিত বিষয়টির ওপর প্রকৃত আলোকপাত ঘটুক, তাঁরা এই ধরনের অসার বাকযুদ্ধের নীরব শ্রোতা হয়ে থাকতে পারে না। কারণ জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং রেনেসাঁস সম্পর্কে যদি আমাদের ধারণা স্বচ্ছ না থাকে, তবে আজকের দিনে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে সচেতন মানুষ হিসাবে করণীয় কর্তব্যটি কি হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। সাধারণভাবে যেটা দেখা গেছে তা হ'ল সিপিআই ও পরে সিপিএমের খণ্ডিত রেনেসাঁসের তত্ত্ব ছাড়া এ বিষয়ে তাঁদের কোনও অভিন্ন মূল্যায়ন নেই। তাদের দলীয় নেতারা বিষয়গুলির ওপর সময় বিশেষে নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী যে যেমন ইচ্ছা মতামত দিয়ে থাকেন। এমনও দেখা গেছে যে, একই বিষয়ের ওপর তাঁদের দলের দুই নেতার বক্তব্য একেবারে পরস্পরবিরোধী। কিন্তু সে ব্যাপারে তাঁদের তেমন কিছু যায় আসে বলেও মনে হয় না। কারণ এইসব নির্বিবাদে চলছে। আর তাঁদের এই আচরণের ফলে প্রণব মুখার্জী বা অন্যান্য কংগ্রেসী নেতা- যাঁরা ভারতীয় জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষার জন্য মায়াকান্নায় বুক ভাসিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদের আড়ালে শাসক পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষায় সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে চান এবং বিজেপির উগ্রতার বিপরীতে ‘নরম’ হিন্দুত্বের লাইন নিয়ে চলেন তাঁরা অত্যন্ত লাভবান হন। কালক্ষেপ না করে মানুষের আবেগপ্রবণ জাতীয় মানসিকতায় তুফান তুলে মানুষকে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত করে তুলতে প্রয়াসী হন। আনন্দমঠকে নিয়েও তাই হচ্ছে। সরোজবাবুরা যে মুহূর্তে একে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে প্রণববাবুরা ‘দেখ কমিউনিস্টরা কত খারাপ, এরা বন্দেমাতরমকে পর্যন্ত অপমান করে’ বলে হৈহুল্লোড় শুরু করে দেন। ভাবখানা এমন যেন কংগ্রেস নেতারা দেশের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সব বড় বড় উত্তরসাধক, জাতীয়তাবাদী মনীষীদের, ব্রিটিশবিরোধী মুক্তি আন্দোলনের সৈনিকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার নিষ্ঠায় অবিচল। আর অন্যদিকে সরোজবাবুদের ধারণা হ’ল তাঁরা অপ্রচলিত কিছু বলে একটা বিরাট প্রগতিবাদী কিছু করে ফেলেছেন এবং জনসাধারণকে চিন্তাভাবনার দারুণ কিছু খোরাক জুগিয়েছেন।

তথাকথিত মার্ক্সবাদী নেতারা যাই বলুন বা প্রণববাবুরা যেভাবেই তাকে ব্যাখ্যা করুন, বিজেপি যতই ত্রিশূল বাগাক, প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আনন্দমঠের যথাযথ বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন তার কোনোটার ওপরই নির্ভর

করে না। বঙ্কিম-সাহিত্য বিশেষ করে আনন্দমঠের সমাজমূল্য বিচার করতে হলে আমাদের সমসাময়িক যুগটাকে ভাল করে বুঝতে হবে এবং এই বোঝার ক্ষেত্রে, তথ্য থেকে সত্যে উপনীত হবার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিটিকে হতে হবে বাস্তবানুগ, বৈজ্ঞানিক, যুক্তিনিষ্ঠ। তা না হলে কোনও শিল্পী-সাহিত্যিকেরই দার্শনিক চিন্তাটিকে আমরা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবো না। যুগ পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে তার সুনির্দিষ্ট অবস্থানটিকেও চিহ্নিত করতে পারবো না। ফলে তাঁদের সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্যের বিচারও হবে অসম্পূর্ণ, অনৈতিহাসিক এবং স্বাভাবিক কারণেই পরিত্যাজ্য। বিশেষ কোনও শিল্পী-সাহিত্যিক মনীষীর চিন্তায় যদি যুগ চাহিদার বিচারে কোনও নেতিবাচক দিক থেকে থাকে তবে তাঁর দর্শন-ভাবনার সামগ্রিক পরিমণ্ডলেই সেটিকে তুলে ধরতে হবে। নচেৎ বিচ্ছিন্ন করে ঘটনাকে বোঝার চেষ্টায় দৃষ্টি পরিষ্কার হবার - বদলে আরও বেশি করে ঘোলাটে হবে।

ধর্মানুরাগ, ধর্মীয় অন্ধতা আর সাম্প্রদায়িকতা এক নয়

আনন্দমঠের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিচারের পূর্বে আরেকটি বিষয়ও একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। দর্শনগত দিক থেকে ধর্মীয় চিন্তার প্রতি অনুরাগ ও ভাববাদী-চেতনার প্রতি আসক্তি আর সাম্প্রদায়িকতা এক জিনিস নয়। বিশেষ কোনও ধর্মের প্রতি কারও প্রগাঢ় অনুরাগ থাকতে পারে, অন্ধবিশ্বাস থাকতে পারে, সংস্কারে মন ছেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ঐটির দ্বারাই তাকে সাম্প্রদায়িক বলা যায় না। নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সে অন্য ধর্মকে খাটো মনে করতে পারে, হেয়ও করতে পারে। এটা ধর্মীয় অন্ধতা হতে পারে, সাম্প্রদায়িকতার বনিয়াদ হতে পারে, কিন্তু এটাই সাম্প্রদায়িকতা নয়। কোনও প্রকৃত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী যিনি যুক্তিনিষ্ঠ বিচার বিশ্লেষণে বিশ্বাসী এভাবে চিন্তা করেন না। ধর্মকে যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, এক ধর্মকে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে উস্কে দেওয়া হয়, ধর্মীয় জিগির তুলে এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের ওপর নিপীড়ন চালানোর জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হয়, তখনই তা হয় সাম্প্রদায়িকতা- যার মতো ঘৃণ্য জঘন্য অপরাধ আর হয় না। কাজেই বিশ্বাসের দিক থেকে কেউ গোঁড়া হিন্দু বলেই মুসলিম-বিরোধী কিংবা খাঁটি মুসলমান হলেই তিনি হিন্দুবিদ্বেষী এজাতীয় বিচারের সঙ্গে বাস্তব সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই। সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিচার করতে গেলে দেখা যাবে যে ধর্মীয় চিন্তার গণ্ডী থেকে আমাদের এ আন্দোলন কখনই মুক্ত হতে পারে নি। ধর্ম এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রায় ওতপ্রোতভাবেই মিশে ছিল। কীভাবে এই ধর্মীয় চিন্তা এবং অধ্যাত্মবাদ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অনুপ্রবেশ করেছে তা দেখাতে যদি কেউ প্রবৃত্ত হন তো নিঃসন্দেহে তার মূল্য অপরিসীম। কারণ স্বাধীনতার পর অর্ধশতাব্দী কেটে যাওয়া সত্ত্বেও আজও আমরা ধর্মীয় মনোবৃত্তি থেকে নিজেদের পুরোপুরি মুক্ত করতে পারিনি। জাতীয় নেতাদের ধর্মনিরপেক্ষতার বাগাড়ম্বর যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তত আমরা ধর্মীয় চিন্তাকে আরও সর্বপ্রযত্নে মনের গহনে লালনপালন করে চলেছি। কাজেই জাতীয় মানসিকতার ধর্মভিত্তির যথার্থ কারণ অনুসন্ধানের দিকে পা না বাড়িয়ে যদি কেউ জাতীয় আন্দোলনের একটা বিশেষ অধ্যায়কে কটাক্ষ করে বা তার গৌরব প্রচার করেই কর্তব্য শেষ বলে মনে করেন, তবে তাতে হয়তো আশু কোনও প্রয়োজনে সম্প্রদায় বিশেষের অসচেতন মনের ক্ষণিক সমর্থন কুড়োনো যেতে পারে, কিন্তু সমাজ-সচেতনতার বিচারে তা নিতান্তই হাস্যকর বলে পরিগণিত হবে। সন্দেহ হয়, এটি যাঁরা করেন তাঁরা কি আদৌ মানুষকে ধর্মচিন্তার প্রভাব থেকে মুক্ত করায় আগ্রহশীল নাকি নেহাৎই কোনও সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে ব্যস্ত? স্থান ও কালের পটভূমিতে বন্দেমাতরম গান ও আনন্দমঠকে যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেই এর প্রকৃত উত্তর পাওয়া যাবে।

ইউরোপীয় নবজাগরণ

সামন্ততান্ত্রিক কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে আপসহীন বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার পথেই একদিন ইউরোপে বুর্জোয়া নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল। সেদিন দেশজোড়া সামন্ততন্ত্রবিরোধী সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পরিচালনা করেছে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী। সামন্তী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যুগের চাহিদা পূরণে অক্ষম হয়ে পড়লে নতুন সমাজ আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক হিসাবেই পুঁজিবাদী অর্থনীতি পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক সমাজে কায়েম হয়। নতুন এই উৎপাদন ব্যবস্থার অনুপূরক সাংস্কৃতিক সামাজিক আন্দোলনটিও ছড়িয়ে পড়ে। পুরনো সামন্তী সমাজ ভেঙে নতুন গণতান্ত্রিক সমাজ প্রবর্তন করার উদ্দেশ্য থেকে একদিকে যেমন তখন বুর্জোয়া শ্রেণী নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়েছে, তেমনই সামন্তী নীতি-অনুশাসন, ধর্মীয় মূল্যবোধ, আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আধিপত্যের বিরুদ্ধেও লড়াই চালিয়েছে। মানুষও অতিপ্রাকৃত সত্তার প্রতিভূ হিসাবে ভাবার সামন্তী-চিন্তা থেকে মানবমনকে মুক্ত করে ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তির স্বাতন্ত্রবোধকে জাগরিত করতে চেয়েছে। সামন্ততন্ত্র ভেঙে পুঁজিবাদী অর্থনীতি সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের এই যুগকেই রাজনৈতিক পরিভাষায় বলা হয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ। বুর্জোয়া মানবতাবাদ এই পুঁজিবাদেরই আদর্শগত-সংস্কৃতিগত কাঠামো। রাজতন্ত্র এবং ধর্মের অস্বীকৃতির মধ্য থেকে জন্ম হওয়ায় বুর্জোয়া মানবতাবাদ তার উন্মেষলগ্নে মূলত ধর্মনিরপেক্ষ (সেকুলার) রূপ নিয়েই গড়ে উঠেছে। এই ধর্মনিরপেক্ষতাই ছিল সেদিন বুর্জোয়া মানবতাবাদ চালিত রেনেসাঁস আন্দোলনের বলিষ্ঠতার অন্যতম কারণ।

ভারতীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

কিন্তু ভারতবর্ষে যখন রেনেসাঁস আন্দোলনের স্ফুরণ দেখা দেয় তখন আন্তর্জাতিকভাবে পুঁজিবাদ ক্ষয়িষ্ণু রূপ পরিগ্রহ করেছে। পুঁজিবাদী বিকাশের এক বিশেষ পর্যায়ে এসে ইউরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন বুর্জোয়া শ্রেণী তখন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সমস্তক্ষেত্রে তার প্রগতিশীল ভূমিকা দ্রুত নিঃশেষিত করে ফেলছে। ইউরোপে তখন তারা অত্যাচারী শাসকের ভূমিকায় এবং সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করার মধ্য দিয়ে অপরের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে চলেছে। নিজস্বার্থে বুর্জোয়ারা ধর্মের সঙ্গে আপস করে মিশনারিদের ভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যবাদের নকিব হিসাবে পাঠাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের যুগে পুঁজিবাদের আদর্শগত-সংস্কৃতিগত উপরকাঠামো হিসাবে বুর্জোয়া মানবতাবাদ আর তার সেই আপসহীন সংগ্রামী তেজ নিয়ে অবস্থান করতে পারে না। একদিন যে বুর্জোয়ারা যুক্তিভিত্তিক স্বাধীন মুক্ত চিন্তাধারায় গোটা মানবমনকে দীক্ষিত করতে চেয়েছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা নিজেরাই অত্যাচারী শাসকের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুণ আর তাদের পক্ষে সেই মুক্ত স্বাধীন চিন্তার জয়গান সম্ভব নয়। তারা তখন যুক্তিকে অস্বীকার করতে চাইছে, মনের সাবলীল গতিময়তাকে রুদ্ধ করে প্রচলিত ধ্যানধারণার চৌহদ্দিতে তাকে আটকাতে চাইছে। সাথে সাথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধ শক্তি হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছে এবং শ্রেণী হিসাবে তারা ক্রমাগত সুসংহত হচ্ছে। ফলে সর্বহারা বিপ্লবভীতি পুঁজিবাদকে ক্রমশই সন্ত্রস্ত করে তুলছে। নিজেদের শ্রেণীশাসন বজায় রাখার জন্য তখন বুর্জোয়া শ্রেণী নানারকম পশ্চাদপদী চিন্তা এমনকি ধর্মীয় চিন্তার সঙ্গে আপস রফার পথে এগোতে চাইছে। ফলস্বরূপ বুর্জোয়া মানবতাবাদ তার পূর্ববর্তী আপসহীন চারিত্রিক বলিষ্ঠতা হারিয়ে ঐতিহ্যবাদী, পুরনো ভাববাদী আদর্শ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, শাশ্বত ধারণার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে জরাগ্রস্ত আপসমুখী হয়ে পড়ছে।

ভারতীয় রেনেসাঁসের দুই ধারা

এরকম আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ভারতীয় রেনেসাঁসের সূত্রপাত। মূলত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনকে ভিত্তি করেই এর সূচনা ঘটে। রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত এদেশের রেনেসাঁস আন্দোলন যে ব্যাপ্তি পেয়েছিলো তাতে এদেশের শিক্ষিত মানুষের মনে বুর্জোয়া মানবতাবাদকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন ব্যক্তি-আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতে থাকে। ব্যক্তির বিকাশ, ব্যক্তির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিমুক্তি, নারীমুক্তি, প্রভৃতি উন্নত বুর্জোয়া মূল্যবোধ শিক্ষিত সমাজকে নানাদিক থেকে আলোড়িত করতে থাকে। ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনকে ঘিরে জন্ম নিলেও ক্রমোন্নতির পথে এই বুর্জোয়া মানবতাবাদ বিদ্যাসাগরের মধ্যে এক আশ্চর্য বলিষ্ঠতা নিয়ে দেখা দেয়। ইউরোপের আপসহীন, যৌবনোদ্দীপ্ত সেকুলার মানবতাবাদের উত্তাপ নিয়ে এলেন বিদ্যাসাগর, চিন্তার ও কর্মের আধুনিকতায় অনেকক্ষেত্রে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন ইউরোপের মানবতাবাদীদের। বলতে গেলে তিনি ছিলেন ভারতীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের মূল ধারার মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট ব্যতিক্রম। কিন্তু, বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি এবং তার পর ভারতীয় রেনেসাঁসের গতিধারা অধ্যাত্মবাদ ঐতিহ্যবাদের সঙ্গে আপসের মধ্য দিয়েই এগোলো। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই আপসমুখী টানের প্রাথমিক প্রবক্তাদের অন্যতম। অনেক পরে শরৎচন্দ্র এবং নজরুলের মধ্যে আপসহীন পার্থিব মানবতাবাদের সুরটি ধ্বনিত হলেও রেনেসাঁসের মূল আন্দোলন এবং সেই সঙ্গে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্রোতটি কিন্তু ধর্মীয় চিন্তার আবর্ত থেকে কখনই মুক্ত হতে পারেনি।

এটা কার্যকারণ সম্পর্কহীন কোনও আকস্মিক বিছিন্ন ঘটনা নয়। এরও ঐতিহাসিক বাস্তবভিত্তি আছে। ভারতীয় পুঁজিবাদ, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসাসূত্রে আবদ্ধ হবার পরিণতিতে সৃষ্ট মুৎসুদ্দি পুঁজি এবং দেশীয় পুঁজির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে এদেশের জাতীয় পুঁজি গড়ে উঠেছে। গড়ে ওঠার লগ্নে একদিকে যেমন সে চেয়েছে দেশীয় শিল্প গড়ে উঠুক, গড়ে উঠুক জাতীয় বাজার, জাতীয় বাজারে তার আধিপত্য সুনিশ্চিত হোক। আবার সাথে সাথে তাকে এগোতে হয়েছে বিদেশি পুঁজির ছত্রছায়ায়। অর্থনৈতিক পরাক্রমের প্রতিযোগিতায় সে বরাবরই বিদেশি পুঁজির কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে! আবার জাতীয় পুঁজির এই স্বাধীন বিকাশের আকাঙ্ক্ষা প্রতিকূল পরিবেশে পদদলিত হওয়ায় তাকে ঘিরে গভীর অসন্তোষও ধূমায়িত হয়েছে। একদিকে বাজার নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সাথে দ্বন্দ্ব আবার সাথে সাথে এঁটে না উঠতে পারার দরুণ তার সঙ্গে আপস, ভারতীয় পুঁজিবাদের এই একই সঙ্গে বিরোধ ও আপসের দ্বৈত সত্তারই প্রতিফলন ঘটেছে সাংস্কৃতিক জগতে রেনেসাঁস আন্দোলনের আপসমুখী চরিত্রের মধ্যে। একমাত্র ইতিহাসকে দুচোখ বুজে অস্বীকার না করতে চাইলে এ বাস্তব সত্য না মেনে উপায় নেই।

ব্যক্তি-লাঞ্ছনার সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত

একদিকে যখন অর্থনৈতিক অসন্তোষ এমন প্রবল, অন্যদিকে তখন সামাজিক সাংস্কৃতিক জগতেও ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হচ্ছিল অনুরূপ আর এক তীব্র ক্ষোভ। আমরা দেখেছি যে একদা সামন্তী অর্থনীতি সমাজের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাকে ভেঙে নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পত্তন করার প্রয়োজনেই পুঁজিবাদ এসেছে। উৎপাদনযন্ত্রের ওপর সামন্তী ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে পুঁজিবাদী ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছে পুঁজিবাদ। সমাজ-অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে এটিই ছিল সেদিন সমাজ-আকাঙ্ক্ষা। ফলে সেদিন এই সমাজ-আকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের ধারণায় ধরা পড়েছে। ব্যক্তির স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠাই ছিল সেদিন সামাজিক আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। আর এই আন্দোলনেরই ব্যক্তিকৃত রূপ, সমাজ আকাঙ্ক্ষার ব্যক্তিকৃত প্রকাশ

ঘটেছে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ব্যক্তি-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। কিন্তু বুর্জোয়া মানবতাবাদী চিন্তার প্রভাবে এদেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে নবজাগ্রত ব্যক্তি-আকাঙ্ক্ষাগুলি জেগে উঠেছিলো, বিদেশি শাসনের সঙ্কীর্ণ পরিবেশে তার বাস্তবায়নের সম্ভাবনাও ছিল অত্যন্ত সঙ্কুচিত। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়দের ব্যক্তিমর্যাদা বারবার বিদেশি শাসকদের হাতে ক্ষুণ্ণ ও লাঞ্ছিত হচ্ছিল। ব্যক্তিকে ঘিরে এই লাঞ্ছনা ঘটলেও এই ব্যক্তি-লাঞ্ছনা ছিল তৎকালীন পরিপ্রেক্ষিতে জাতিগত লাঞ্ছনা। ফলে এই ক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে একটা গভীর সামাজিক অসন্তোষও ব্যাপক রূপ নিচ্ছিল। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উভয় ক্ষেত্রের এই অসন্তোষকে ঘিরেই সেদিন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চিন্তা ইতিহাসের নিয়মেই ধীরে ধীরে উন্মেষিত হতে থাকে।

ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষস্তরে আনন্দমঠের রচনা

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এই উন্মেষ পর্বেই ১৮৮২ সালে আনন্দমঠের সৃষ্টি। মনে রাখা দরকার জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয় আরও তিন বছর পর ১৮৮৫ সালে। আধুনিক জাতিগঠনের তত্ত্ব এবং জাতীয় চেতনাও বুর্জোয়া মানবতাবাদেরই ফসল। বুর্জোয়া মানবতাবাদ তার উত্থানলগ্নে যে ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলার জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছে, ক্ষয়িষ্ণু আপসমুখী হয়ে পড়ার পর আর সেই বলিষ্ঠতা তার কাছে আশা করা বৃথা। বরং অধ্যাত্মবাদ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে আপসরফার প্রবণতাটি তার সেই সময়কার জাতীয় চেতনাতেও বিধৃত ছিলো। ভারতবর্ষে ঠিক তাই ঘটেছে। ভারতীয়

জাতীয়তাবাদ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কণ্ঠে মিলিয়ে "বেদ বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন" এই ঘোষণার পথে দৃপ্ত বলিষ্ঠতায় সেকুলার রূপ নিয়ে গড়ে উঠতে পারে নি। পরিবর্তে বঙ্কিম-চিন্তায় প্রতিভাত ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের পথেই তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। বুর্জোয়া মানবতাবাদকে ভিত্তি করে উদ্ভূত এই জাতীয় চেতনা একদিন ইউরোপে রাজতন্ত্র এবং চার্চডমের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বিরোধিতার রাস্তা ধরেই এগিয়েছে। ফলে সেদিন তার অগ্রগতি ছিল অপ্রতিরোধ্য, দুর্বার। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাসটি হলো অন্যরকম। এদেশে বুর্জোয়া মানবতাবাদ ক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্ব ও জাত্যভিমান ধর্ম এবং ঐতিহ্যবাদকে অস্বীকার করার পরিবর্তে তারই পৃষ্ঠপোষকতাপ্রার্থী হয়ে পড়লো। সেকুলার মানবতাবাদের বলিষ্ঠ চিন্তাকে হাতিয়ার না করে আত্মবল অর্জনের উৎস খুঁজে পেতে চেষ্টা করলো ধর্মগ্রন্থের পাতায়। মানবতাবাদকে ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে মেশাতে গিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই জাতীয়তাবাদী চিন্তা তার জন্মলগ্নেই ধর্মীয় চেতনার নাগপাশে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে লাগলো। আপসমুখী মানবতাবাদ সৃষ্ট এই ধর্মভিত্তিক জাতীয় চেতনার মন্ত্র যাঁরা বয়ে নিয়ে এলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। আর তাই সেদিন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শগত বিরোধ ছিল তুঙ্গে। তৎকালীন পত্রপত্রিকার পাতায় এর প্রমাণ মিলবে অনেক। একদিকে যেমন বিদ্যাসাগর তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ বলিষ্ঠ মানবতাবাদের খোলাখুলি প্রচার করেছেন, বেদ বেদান্তকে অসার বলে প্রমাণিত করেছেন, ধর্মীয় মূল্যবোধের অকার্যকারিতা প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছেন, অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় চেতনার প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সুদৃঢ় হিন্দুধর্মবিশ্বাসকে লুকোতে চাননি। সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে জনগ্রাহ্য করাতে চেয়েছেন। তিনি ছিলেন নৈষ্ঠিক হিন্দু, হিন্দুধর্মের শিকড় ছিল তার অন্তরের অন্তঃস্তলে। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয়রা যদি জাতি হিসাবে মাথা তুলতে চায়, বিদেশি শাসকের সঙ্গে টক্কর দিতে চায় তবে তাদের ভারতের প্রাচীন ও সনাতন ধর্মের মধ্য থেকেই নৈতিক তেজ ও বল লাভ করতে হবে। আর সনাতন হিন্দু ধর্মই ভারতীয় ঐতিহ্যের মূলমন্ত্র। জাতীয়তাবাদী চিন্তাপ্রসূত প্রতিটি গুণাবলী, মূল্যবোধকেই তিনি বেদ বেদান্ত গীতার আলোকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। এমনকি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সশস্ত্র সংগ্রামরূপে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিকতা এবং রণকৌশলও তিনি হিন্দুধর্মশাস্ত্রের থেকে পাওয়া সম্ভব বলে মনে করেছেন। এভাবেই ঐতিহ্যবাদ ও অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে

জাতীয়তাবাদকে মেশানোর চেষ্টা তিনি করেছেন। আর সেই সাহিত্য-চেষ্টারই ফলশ্রুতি আনন্দমঠ। আমরা চাই বা না চাই এই হিন্দুধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদই স্তরে স্তরে আরও পরিশীলিত হয়ে অবশেষে হিন্দু জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়। দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই হিন্দুধর্ম-কেন্দ্রিকতা দেশের একটা বিরাট সম্প্রদায়, মুসলিম সম্প্রদায় যাঁদের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যাপক অংশগ্রহণের বিরাট সম্ভাবনা ছিল তাঁদের, এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ব হবার পথে বিরাট বাধা হিসাবে দেখা দেয়। ব্যক্তিগতভাবে বহু মুসলিম এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেও পরবর্তীকালে সম্প্রদায়গতভাবে মুসলিমদের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধীবাদী নেতৃত্ব সম্বন্ধে একটা সন্দিহান মনোভাব থেকেই য়ায়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথে এই ধর্মভিত্তির বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা না করার দরুণ মুসলিম সম্প্রদায়ের মন থেকে এই সংশয় দূর করা সম্ভব হয়নি। জাতীয় আন্দোলনে এই দুর্বলতা থেকেই গেছে এবং এই দুর্বলতাই পরবর্তীকালে নানা ঘাত প্রতিঘাত টানা পোড়েনের পথে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ ভেঙে দুভাগ করেছে। আজও আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানগুলিতে হিন্দুধর্মনির্দেশিত আচার আচরণকে মাঙ্গলিকজ্ঞানে পালন করা হয়। শঙ্খ বাজিয়ে নারকেল ভেঙ্গে কোনও কিছুর উদ্বোধন হয়, মঞ্চে ডাব-কলাগাছও থাকে। প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন হয়। স্বভাবতই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা এসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে একাত্মবোধ করেন না এবং ধর্মকে কেন্দ্র করে একটা দ্বিধা সংশয় কিংবা সংরক্ষিত মনোভাব থেকেই যায়। ধর্ম ভিত্তিতে এ জিনিস থাকার জন্য বহু ধর্ম অধ্যুষিত এদেশে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য এবং আরও বহু অনভিপ্রেত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটার বাস্তব সম্ভাবনাও থেকে যায়। এমন নয় যে, কেবল কংগ্রেসী নেতা ও মন্ত্রীরাই ধর্মনিরপেক্ষতার সুশ্রাব্য বুলির আড়ালে এধরনের জাতীয় পর্যায়ের অনষ্ঠানে অক্লেশে যোগদান করেন, আচার পালন করেন। তথাকথিত মার্ক্সবাদীরাও করেন। কমিউনিজম বাদ দিলাম, সেকুলারিজমের ন্যূনতম ছিটে-ফোঁটা টিকে থাকলেও যা করতে বাধা দেয়, তথাকথিত মার্ক্সবাদীরাও দিনের পর দিন বিনা দ্বিধায় হিন্দুধর্মের সেই ফুলচন্দনের চর্চা এবং আধিপত্যকে মেনে নিয়ে সর্ববিধ রাষ্ট্রস্তরের অনুষ্ঠানে সামিল হচ্ছেন। জানি না তাঁরা এর মধ্য দিয়ে কোন অভিনবত্বে সাম্প্রদায়িকতার বীজ নিশ্চিহ্ন করছেন।

বিশ্বাসযোগ্য পটভূমির সন্ধান থেকে সন্ন্যাসীবিদ্রোহের আখ্যান অবলম্বন

হিন্দুধর্মভিত্তিক জাতীয় চেতনাকে সঞ্চারিত করার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ রচনা করা। কিন্তু এই রচনাকে একটা বিশ্বাসযোগ্য পটভূমির ওপর দাঁড় করাতে তিনি ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়েছেন। চেয়েছেন ইতিহাসের এমন অধ্যায়কে খুঁজে নিতে যার আশ্রয়ে আকাঙ্ক্ষিত জাতীয়তাবোধের প্রকাশ কল্পনার রঙ মিশিয়ে ভিন্ন ঢঙে ঘটালেও তা পরাধীন বিক্ষুব্ধ দেশবাসীকে আত্মবলে বলীয়ান করে বিদেশি শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে। আবার উপন্যাসটিকে নেহাৎই কল্পনার প্রসব বলে অগ্রাহ্য করা যাবে না। তথ্যের প্রামাণিকতা ঘটনার সত্যতা যাচাই করাবার সাথে সাথে গ্রন্থটিকে বিশ্বাসগ্রাহ্য করে তুলবে। পাঠক অতীত গৌরবের আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে ভবিষ্যৎ লড়াই-এর প্রেরণা ও পথনির্দেশ লাভ করবে। এই বিশ্বাসযোগ্য পটভূমি অন্বেষণের পথেই ১৭৭০-৭২ সালে বাংলার সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ইতিহাসকে পটভূমি হিসাবে বেছে নিয়েছেন তিনি। বঙ্কিম যদি হিন্দু ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতেন তবে দেখতে পেতেন সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সহোদর ফকির বিদ্রোহে মুসলমান জনগণই প্রধান শক্তি। মজনু শাহের নেতৃত্বে সেই লড়াই হিন্দু বঙ্কিমের চোখ এড়িয়ে যায়। অথচ বর্তমান বাঙলাদেশের বিশাল এলাকা জুড়ে ফেটে পড়া ফকির বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসকদের হৃদকম্প সৃষ্টি করেছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের চিঠিপত্র দলিল, হান্টারের লেখা ‘Annals of Rural Bengal’, ভিনসেন্ট

স্মিথের Oxford History প্রভৃতিতে এই সময়কার ভয়াবহ মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী ফকিরদের বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাগত সীমাবদ্ধতা

এই প্রেক্ষাপটে আনন্দমঠের সৃষ্টিকে বুঝতে হবে। আর তা হলেই পরিষ্কার হবে কেন তিনি ইংরাজ শাসনকালের মধ্যাহ্নে শতবর্ষের পুরনো এক যুগের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। হতে পারে তাঁর এই বিষয় নির্বাচন অতিমাত্রায় হিন্দুধর্মানুরাগবাহিত কলম সে যুগের বিচারে অমনস্তাত্ত্বিক উপস্থাপনা বলে গণ্য হবার যোগ্য। সে বিষয়ে আমরা আসছি। কিন্তু আনন্দমঠ রচনার পেছনে কোনও অনাবৃত রহস্য নেই, নেই কোনও অন্যায় অভিপ্রায়। দুর্বলতাকে শঠতা বলে ভাবলে ভুল হবে। চিন্তার সীমাবদ্ধতাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যা দিলে অজ্ঞতা প্রকাশ পাবে আমাদেরই। বিভ্রান্তির জট তাতে বিন্দুমাত্র খুলবে না, বরং আরও ঘনীভূত হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের নৈষ্ঠিক হিন্দুমনের পরিচয় কেবল আনন্দমঠেই নয়, তাঁর বহু প্রবন্ধ এবং প্রায় সব উপন্যাসেই মেলে। যেমন বুর্জোয়া মানবতাবাদী আদর্শের পূজারী হিসাবে নরনারীর ভালবাসাকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন, যুক্তি অনুযায়ী মেনেও নিয়েছেন যে, ভালবাসার ক্ষেত্রে গতিহীন একনিষ্ঠ প্রেম অবাস্তব। কিন্তু তথাপি হিন্দু সংস্কারের প্রভাবে এ প্রেমের প্রতি সাদর অভিনন্দন জানানোর ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে দ্বিধা একটা থেকেই গেছে। মানসিকতার এই অদ্ভুত দ্বন্দ্ব, নূতন জীবনচাহিদাকে স্বীকৃতি দেবার প্রশ্নের সঙ্গে সংস্কারবাদী আধ্যাত্মিক মনের পিছুটানের দ্বন্দ্ব মীমাংসায় যুক্তিবিজ্ঞানের পরিবর্তে ঐতিহ্য ও ধর্মকে জোর করে প্রাধান্য দেবার এই প্রবণতা তাঁর সাহিত্যের অনেক সম্ভাবনাময় চরিত্রকে ম্লান করেছে, অনেক সুন্দর সম্পর্ককে ব্যর্থ পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নগেন্দ্র-কুন্দ 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণী-গোবিন্দলাল প্রভৃতি সবই এর উদাহরণ।

আরও লক্ষ করলে ধরা পড়বে যে, বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের এত চেষ্টা করলেও যেহেতু ধর্মীয় মূল্যবোধ তখন জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেত অক্ষম তাই জীবানন্দ, ভবানন্দ প্রমুখ সর্বত্যাগী সন্তানদের চারিত্রিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও নিদারুণ বিপর্যয় লক্ষ্য করা যায়। সন্তানধর্মে বিশ্বাসী হলেও চরিত্রের সবদিক ব্যাপ্ত করে এই আদর্শে তাঁরা অবিচল থাকতে পারেনি। ক্ষণিকের মোহ বা উত্তেজনায় তাদের ব্রহ্মচর্য, সংযম ভেঙে পড়েছে। সামান্য পরীক্ষাতেই বাস্তব জীবনের দাবি ধর্মের কৃত্রিম নিষ্ঠা ভেঙে দিয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে ঘটেছে চারিত্রিক অধঃপতন। বঙ্কিমচন্দ্র ইচ্ছা করেই ব্রহ্মচারী সন্তান যাঁদের তিনি দেশভক্ত আদর্শবাদী চরিত্রের প্রতিভূ বলে মনে করেছেন তাঁদের এই পদস্খলন দেখিয়েছেন এরকম ভাবার নিশ্চয়ই কোন কারণ নেই। আসলে পশ্চাৎপদ চিন্তার অনুগামী মন নিয়ে আরোপিত মূল্যবোধের আধারে তিনি চরিত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছেন এবং স্বভাবতই বিকাশের পথে তাদের সার্থক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে তাঁর কলম বারবার আটকে গেছে। বিশ্বাস ও আকুতির সঙ্গে বাস্তব চাহিদা ও বাস্তব আকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত গরমিল এভাবে কেবল বঙ্কিম-সাহিত্যেই নয় আরও অনেক বড় সাহিত্যেই সার্থক চরিত্র সৃষ্টি হতে দিতে পারেনি। চরিত্র তখনই উন্নত জীবন্ত আকাঙ্ক্ষিত হয়ে দেখা দেয় যখন তার মধ্যে যুগ-চেতনার যথার্থ প্রতিফলন ঘটে। একইভাবে আনন্দমঠের শান্তি-চরিত্রটিও মার খেয়েছে। সাহসে, জ্ঞানে, শৌর্যে সে কোন পুরুষ চরিত্রের চেয়েই কম নয়। তবে বলিষ্ঠতা খানিকটা এলেও তার মধ্যে নারীচরিত্রের অন্যান্য উন্নত দিকগুলো কিন্তু তেমন করে উপন্যাসে আসেনি। কারণ দেশের কাজে নারী-পুরুষ একত্রে একইভাবে আত্মনিয়োগ করবে, এটা বঙ্কিমচন্দ্র মন থেকে কিছুতেই মানতে পারেন নি।

ভেবেছেন এ বুঝি ঠিক নয়। নারীর এরূপ ভূমিকা তেমন বাঞ্ছিত নয়। আর তাই চরিত্র হিসাবে শান্তির কোন সার্থক উত্তরণও ঘটেনি। অভিপ্রেত সাহিত্য-চিন্তাকে প্রকাশ করতে অক্ষম হবার জ্বালাও বোধ হয় তাঁর ছিল। আর তাই আনন্দমঠের শেষে খানিকটা পরাজিত মনোভাবেরই পুনরুক্তি করার মতো তিনি মহাপুরুষ ও সত্যানন্দের সংলাপ রচনা করেছেন---

"মহাপুরুষ - ব্রত সফল হইবে না - কেন তুমি নিরর্থক নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিতা করিতে চাও? যুদ্ধ বিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোকে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক।--- (সত্যানন্দ) বলিলেন--- শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।

মহাপুরুষ - তুমি আর কিছু করিতে পারিবে না- তোমারই দুই বাহু ছিন্ন হইয়াছে, তোমারও আর পরমায়ু নাই!

সত্যানন্দ - না থাকে, এইখানে, এই মাতৃপ্রতিমা সম্মুখে দেহত্যাগ করিব।

মহাপুরুষ - অজ্ঞানে? চল জ্ঞান লাভ করিয়া দেহত্যাগ করিবে চল। হিমালয় শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেইখান হইতে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইব।

...বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল। বিষ্ণুমণ্ডপ জনশূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণুমণ্ডপের দীপ, উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিয়া উঠিল, নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জ্বালিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।"

বলার চেষ্টা তিনি অনেকবারই করেছেন। হয়তো একটু ভিন্ন ঢঙে। 'মৃণালিনী', 'সীতারাম' প্রভৃতি উপন্যাসেও হিন্দুরাজ্য গড়ার এই অবাস্তব স্বপ্ন তিনি দেখেছেন। তবে কল্পনাকে বেশীদূর অগ্রসর হতে দিন মন থেকে তেমন সাড়া পাননি। আর তাই বেশীরভাগ উপন্যাসেরই উপসংহার কিছুটা আকস্মিক এবং বাসনার সাময়িক স্থগিতাদেশে নিষ্প্রাণ।

বন্দেমাতরমের পটভূমি

কাজেই এই হিন্দু ধর্মানুরাগ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় একটা অপরিবর্জনীয় সংস্কার হিসাবেই বিরাজ করেছে। বন্দেমাতরম সঙ্গীত সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য। কোন সন্দেহ নেই যে দেশমাতৃকার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি ব্যক্ত করার প্রেরণা থেকেই এই সঙ্গীত রচনা। পরবর্তীসময় আনন্দমঠ উপন্যাসে এই সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্তি এও প্রমাণ করে যে বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন দেশবন্দনার এই সঙ্গীত দেশবাসীকে উদ্বেলিত করুক, বিদেশি শাসকের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করুক। তাই সেই সঙ্গীতের শুরুতে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা ফুল্লকুসুমিত সুখদায়িনী দেশমাতার স্তবগাথা। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্য এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেশমাতৃকার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে দেশকে দেবী দুর্গার আদলে ধরতে চাইলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাই বন্দেমাতরমের পরবর্তী স্তবকের ভাষা হলো---

বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
তুং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং।।

আনন্দমঠের প্রথম খণ্ড দশম পরিচ্ছেদে ভবানন্দের গলায় এই সঙ্গীতের পরিবেশন। একাদশ পরিচ্ছেদে আরও বিশদে বলা হয়েছে, "ঘরের ভিতর কি আছে মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইলো না দেখিতে দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিত হৃদয় সম্মুখে সুদর্শন চক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভ স্বরূপ দুটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্তি রুধির প্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িত কুন্তলা, শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র মূর্ত্তিমান রাগরাগিণী পরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সর্ব্বোপরি বিষ্ণুর মাথার উপরে উচ্চমঞ্চে বহু রত্নমণ্ডিত আসনোপবিষ্টা এক মোহিনী মূর্ত্তি লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে। ব্রহ্মচারী, অতি গম্ভীর, অতি ভীতস্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকল দেখিতে পাইতেছ? মহেন্দ্র বলিল, "পাইতেছি।"
ব্রহ্ম - উপরে কি আছে দেখিয়াছ?
মহেন্দ্র - দেখিয়াছি, কে উনি?
ব্রহ্ম - মা।
মহেন্দ্র - মা কে?
ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমরা যাঁর সন্তান।"
মহেন্দ্র - কে তিনি?
ব্রহ্ম - সময়ে চিনিবে। বল বন্দেমাতরম্।"
এরপরেই ব্রহ্মচারী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি দেখিয়ে মহেন্দ্রকে বলেন- "মা যা ছিলেন।" তারপর কালীমূর্তিতে "মা যা হইয়াছেন" এবং দশভুজা প্রতিমায় "মা যা হইবেন।"

স্পষ্টতই এখানে হিন্দু পুরাণের কথিত দেবদেবীর রূপকল্পের আধারেই দেশমাতাকে বর্ণনা করতে চাওয়া হয়েছে। খুব স্বাভাবিক কারণেই অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষে এই বর্ণনা মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তাঁরা মনে করেছেন এ তাঁদের ওপর ভিন্ন ধর্মের খবরদারি। তাই বন্দেমাতরম সঙ্গীত ও আনন্দমঠের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর হিন্দুধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই স্বাভাবিক ক্ষোভ বা বিরক্তিবোধকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে বিষয়টির যথাযথ নিষ্পত্তিতে আগ্রহ দেখাননি। বরং কিছু উদারপন্থী নেতা চেয়েছিলেন যে বন্দেমাতরম সঙ্গীতের প্রথম দুটি স্তবক যেখানে শুধু দেশমাতার প্রাকৃতিক রূপবর্ণনা রয়েছে তাকেই জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করা হোক। এভাবে বিষয়টিকে জোড়াতালি দেবার চেষ্টা হলেও মূল কারণটি গভীরে থেকেই গেছে। আজ যারা পুনরায় বন্দেমাতরম নিয়ে মেতেছেন এবং এর মধ্যেই যাবতীয় দেশপ্রেমের সন্নিবেশ দেখাতে চাইছেন, তারা সেই পুরানো বিভেদটিকেই জিইয়ে তুলতে চাইছেন।

বন্দেমাতরম সঙ্গীতের ভাষা এবং আনন্দমঠে দেশমাতাকে দেবী দুর্গার সঙ্গে তুলনা করে এক বিশেষ ধর্মের আবেদনে বহু ধর্মাবলম্বী দেশের মানুষকে জাগানোর চেষ্টা নিঃসন্দেহে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাগত দুর্বলতার অন্যতম প্রধান দিক এবং এই দুর্বলতা তৎকালীন পরিবেশে বুর্জোয়া মানবতাবাদী চিন্তার আপস-প্রবণ ঝোঁকেরই পরিচায়ক। এভাবে সামগ্রিকভাবে বঙ্কিম-সাহিত্যকে বোঝার পথে যদি কেউ 'আনন্দমঠে'র এবং বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের সাহিত্যমূল্য বিচারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মুসলিমবিরোধী কটূক্তি এবং কিছু অশোভন মন্তব্যে ব্যথা পেতে পারেন, তাকে সমালোচনা করতে পারেন, হিন্দু-স্বর্গরাজ্য গড়ার মতবাদকে অবাস্তব

অযৌক্তিক আখ্যা দিতে পারেন কিন্তু তিনি মুসলিম-বিদ্বেষী ছিলেন, সাম্প্রদায়িক ছিলেন এসব বলা যায় কি? আমরা দেখেছি যে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস বহু ধর্মবিশিষ্ট ভারতবর্ষে ধর্ম বিশেষকে প্রাধান্য দেবার এই প্রচেষ্টায় ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন নিঃসন্দেহে দুর্বল হয়েছে, অনেক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তথাপি যুগযন্ত্রণাকে অভিব্যক্ত করার তাগিদ থেকে রচিত হবার ফলে আনন্দমঠ তৎকালীন ভাবজগতে নিঃসন্দেহে এক আলোড়ন তুলেছিলো।
বিষয়ীগত দিক থেকে আপসমুখী ধ্যানধারণার প্রচারক হলেও এর মধ্যে সহিংস সংগ্রাম, শক্তিচর্চা এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে দিকটি ছিল তা পরাধীন দেশবাসীকে বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করেছে।

আনন্দমঠে মুসলিম-বিরোধিতার প্রকৃত চরিত্র

তবে একথা ঠিক যে, আনন্দমঠ পড়লে বহু জায়গাতেই মনে হবে বুঝিবা লেখক মুসলিম-বিদ্বেষী। যেভাবে বর্ণনা আছে সংলাপ আছে তাতে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের মনে আঘাত লাগাও অস্বাভাবিক কিছু না। কিন্তু এই মুসলিম-বিরোধিতাকে সাম্প্রদায়িক বললে কিন্তু বিচার পক্ষপাত দোষমুক্ত হবে না। বঙ্কিমচন্দ্র যখন সাহিত্য শুরু করেন তখনও দিল্লীতে মোঘলসাম্রাজ্যের শেষ বংশধর টিকে ছিল। এই সমস্ত মুসলিম নবাব বাদশাহের অন্যায় অত্যাচার শোষণ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। রাজসিংহ লেখার সময় তিনি ইতিহাস থেকে হিন্দু সম্প্রদায় ও দেবদেবীর ওপর আওরঙ্গজেবের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী জেনেছেন। আওরঙ্গজেব কর্তৃক অমুসলমানদের ওপর জিজিয়াকর পুনরায় চাপানো, মাড়োয়ার থেকে মন্দির ভেঙে দেবদেবীর মূর্তি গরুর গাড়ি বোঝাই করে দিল্লী দুর্গ প্রাঙ্গণে এবং জামা মসজিদের সিঁড়ির নীচে ফেলে রাখা - ইত্যাদি নানা ঘটনা তাঁর হিন্দু মানসিকতায় প্রচণ্ড ছাপ ফেলেছে। এমন কি সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যে পটভূমিতে তিনি আনন্দমঠ লিখেছেন, বাংলার সেই ভয়াবহ মন্বন্তরের সময় আব্দুল রেজা খাঁ প্রমুখ মুসলিম সুবেদারদের অন্যায় জুলুম করে রাজকর আদায় প্রভৃতি ঘটনা তার মনে গভীর রেশ ফেলেছে। খানিকটা ইতিহাসের প্রতি "সৎ" হতে গিয়ে আর খানিকটা হিন্দুধর্মের প্রগাঢ় ভিত্তিতে আঘাত পাবার প্রতিক্রিয়ায় তিনি মুসলিম রাজা নবাবদের বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেক করতে চেয়েছেন, কিন্তু এটি করতে গিয়ে হিন্দু বিশ্বাসের আতিশয্যে তিনি ক্রমশই নবাব বাদশাদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে বাক্যবাণ শাণিত করার পরিবর্তে তাদের ধর্ম অর্থাৎ মুসলিমধর্মকেই আঘাত করে ফেলেছেন। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের সঙ্কে বঙ্কিমের চিন্তাধারার পার্থক্য লক্ষণীয়। উভয়ে সমকালীন হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর "বাঙালীর ইতিহাস" রচনাকালে যে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত নিরপেক্ষ মনের পরিচয় দিয়েছেন, বঙ্কিমে তা নেই। বিদ্যাসাগর বাংলার নবাব সিরাজকে দুরাচারী, দুশ্চরিত্র ও অত্যাচারী হিসাবে দেখিয়েছেন, ক্লাইভকে "ধর্মজ্ঞানশূন্য" বলেছেন, আবার ব্রিটিশ প্রচার অগ্রাহ্য করে "অন্ধকূপহত্যার" জন্য সিরাজকে নয়, মানিকচাঁদকে দায়ী করেছেন। মুসলমানদের বিদেশি দখলদার হিসাবে চিহ্নিত করেননি। কিন্তু হিন্দুধর্মীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাবে বঙ্কিমের ব্যাখ্যায় মুসলমানরা ভিন্ন জাতীয়। বঙ্কিমের এই মুসলিমধর্ম বিরাগ আনন্দমঠের পাতায় প্রকাশ পেয়েছে এবং প্রকাশদৌর্বল্যে তা মনে হয়েছে মুসলিমবিরোধী বিদ্বেষ। ভারসাম্যের অভাবে এই বিশেষ ধর্মবিরোধী মানসিকতাকে সেই বিশেষ ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষের প্রতি বিদ্বেষ বলে ভুল হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বঙ্কিম-চিন্তার সামগ্রিক ব্যাপকতর প্রেক্ষাপটে বিচার করলে যুক্তিশীল সচেতন পাঠকের মনে এ জাতীয় ভাবনার অবকাশ বোধকরি থাকে না। যুক্তি পরিশ্রুত মনই সূক্ষ্মবিচারে নিদারুণ বিভ্রান্তি-জটের মধ্যে সত্যকে চিনতে বুঝতে সক্ষম। চিন্তাগত দুর্বলতা সত্ত্বেও আনন্দমঠের মূল দ্বন্দ্ব কিন্তু ইংরাজের সঙ্গে সন্তানদের, যুদ্ধও তাদের মধ্যেই হয়েছে। আর সেইজন্য এই আনন্দমঠ পড়েই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত বহু মানুষ সে দিন স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এ স্বীকৃতিও ইতিহাসে মিলবে। মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত বহু শ্রদ্ধেয়,

চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব কিন্তু বঙ্কিম-চিন্তার এই দুর্বলতাকে অনেক অংশে সঠিকভাবেই ধরতে পেরেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিত ও খ্যাতনামা অধ্যাপক ডঃ আহমেদ শরীফ বঙ্কিমসাহিত্যে মুসলমান প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় বলেছেন, "হিন্দু-মুসলমান কি কোনকালে এক ছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যাবে? বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বিজাতি বিদ্বেষী। সাধারণভাবে বিচার করলে এতে অন্যায়, অস্বাভাবিকতা কিছুই পাওয়া যাবে না। কেননা, বঙ্কিম যে মুসলমানকে গাল দিয়েছেন তারা তুর্কী মুঘল শাসকগোষ্ঠী। যে বিদেশি বিজাতি ও বিধর্মী এদেশে চেপে বসল আর দেশবাসীর স্বাধীনতা ও সম্পদ কেড়ে নিল তাদের প্রতি বিরূপ থাকাই তো স্বাভাবিক ও শোভন। সহজাত এই বিরূপতা দেশি অস্বাভাবিকতা কিছুই পাওয়া যাবে না। কেননা, বঙ্কিম যে মুসলমানকে গাল দিয়েছেন তারা তুর্কী মুঘল শাসকগোষ্ঠী। যে বিদেশি বিজাতি ও বিধর্মী এদেশে চেপে বসল আর দেশবাসীর স্বাধীনতা ও সম্পদ কেড়ে নিল তাদের প্রতি বিরূপ থাকাই তো স্বাভাবিক ও শোভন। সহজাত এই বিরূপতা দেশি মুসলমানের গায়েও লাগল, কেন না ধর্মীয় ঐক্য সূত্র এবং আভিজাত্য বোধে দেশি মুসলমানরা নিজেদের তুর্কী মুঘলের জ্ঞাতি ভাবতে শিখেছে। যেমন, দেশি খ্রীষ্টানরা স্বজাতি ভেবেছে ইংরেজকে তুর্কী মুঘলের জ্ঞাতিত্বগর্বী দেশি মুসলমান অকারণে এ নিন্দা গালি নিজেদের গায়ে মাখে। 'মুসলমান' স্থলে 'মুঘল' লিখলে হয়তো তাদের গায়ে এতটা লাগত না। মুসলমান বিদ্বেষবশে করলে 'দুর্গেশ নন্দিনী', মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, সীতারামেও তা থাকত। এর কারণ আরও গভীরে। মুরশিদকুলি খানের পরে কখনো বাঙ্গলায় নানা কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিলনা। মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির দ্রুত ক্ষয়িষ্ণুতা বর্গীয় লুণ্ঠন নবাবদের অযোগ্যতা সমস্ত স্বৈরাচারের বৃদ্ধি ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বেনেদের প্রাবল্য প্রভৃতি জনজীবনে দারিদ্র্য অনিশ্চয়তা বেকারত্ব নিরাপত্তাহীনতা চারিত্রিক শৈথিল্য প্রশাসনিক পীড়ন প্রভৃতি অনিবার্য ও ক্রমবর্ধমান করে তোলে। যে নবাব ও সরকারের ওপর জনজীবন রক্ষার ও জীবিকার নিশ্চয়তাদানের দায়িত্ব রয়েছে, সে সরকার যদি তা পালনে উদাসীন ও অসমর্থ হয়, তাহলে জনজীবনে সর্বদুঃখের কারণস্বরূপ সেই রাজশক্তি ও সরকারের প্রতি মানুষ ক্ষিপ্ত বিরক্ত ও আস্থাহীন হয়ে পড়ে। মনের ক্ষোভ তখন অক্ষম অসহায় মানুষ নিন্দা গালিতেই মিটায়। শাসক শাসিতের পূর্বসম্পর্ক স্মরণ করে উনিশশতকের হিন্দু লেখকমাত্রই মুসলমানদের প্রতি কমবেশী বিরূপতা দেখিয়েছেন।... অন্যদের কথা আলোচ্য নয় কিন্তু বঙ্কিম যুগস্রষ্টা প্রতিভা বলে স্বীকৃত। কাজেই তাঁর পক্ষে এ অনুদার ও অবিজ্ঞজনোচিত মনোভাব দূষণীয়। শাসক-শাসিতের পূর্ব সম্পর্ক যাই থাক না কেন, ইংরেজ শাসনে যখন হিন্দু মুসলমানের ভাগ্য একই সূত্রে গাঁথা তখন দূরদর্শী জাতিপ্রাণ মনীষীর কর্তব্য ছিল হিন্দু মুসলমানের সংহতি সাধন করা। বঙ্কিমের মননদৈন্য এখানে যে, তিনি প্রয়োজন সচেতন ছিলেন না। একচক্ষু হরিণের মত হিন্দুজাগরণের চারণকবির ব্রতকেই বড় মনে করেছেন দেশের সামগ্রিক স্বার্থের দিকে নজর রাখেননি। তাই তিনি হিন্দুর ঋষি হলেন বটে কিন্তু এদেশের চিন্তানায়কের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত রইলেন।... বঙ্কিম সম্বন্ধে আমাদের ক্ষোভ তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল অনেক, পেয়েছি তার চাইতে কম।" শরীফ সাহেবের এই মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টির পরিচায়ক। তবে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটা অংশ এমনকি শিক্ষিত দেশপ্রেমিক মানুষের মধ্যে আজও আনন্দমঠ সম্বন্ধে এবং সেই কারণে বন্দেমাতরম সঙ্গীতকে ঘিরে একটা বিরূপ মনোভাব রয়েছে। যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদীর দায়িত্ব প্রকৃত সত্যকে যুক্তির ভিত্তিতে উদ্ভাসিত করে ধারণাকে যথাযথ হতে সাহায্য করা এবং সমস্তরকম' বিভ্রান্তি সংস্কারকে অপসারিত করে সকলপ্রকার সাম্প্রদায়িক মানসিকতার অবসান ঘটানো। এটির পরিবর্তে জাতীয় সংহতি রক্ষার নাম করে সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ স্বাধীনতা আন্দোলনের মতো আজও আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি, তাকে পরোক্ষ ইন্ধন জুগিয়ে বিশেষ কোন আশু সুবিধালাভের

তাড়নায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষীদের সম্পর্কে দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করতে যদি কারও না বাধে, তবে আর যাই হোক মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

সামগ্রিক বিচারে বঙ্কিম কি সাম্প্রদায়িক?

যাঁরা বঙ্কিমবাবুকে সাম্প্রদায়িক বলে প্রমাণের চেষ্টায় মেতেছেন কিংবা মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত যে সমস্ত চিন্তাশীল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের মনে আনন্দমঠ সম্বন্ধে যথার্থই একটি সংশয় থেকেই গেছে, তাঁদের বঙ্কিম-সাহিত্যের আরও একটা দিক ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। গোটা সাহিত্যজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র যে কটি উজ্জ্বল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন রূপেগুণে চারিত্রিক মহিমায় আয়েষার সমকক্ষ আর কেউ আছে কি? জগৎসিংহ হিন্দু, আয়েষা মুসলমান। কিন্তু জগৎ সিংহের প্রতি আয়েষার যে প্রেম 'দুর্গেশনন্দিনী'তে অপূর্ব সৌন্দর্য নিয়ে বিরাজ করছে, উন্নতরুচি মর্যাদাবোধ আত্মপ্রত্যয়ের যে জ্বলন্ত স্বাক্ষর বহন করছে, মুসলিমবিদ্বেষী হলে এমনটি বঙ্কিমচন্দ্র করতে পারতেন কি? হিন্দু জাত্যভিমান এত প্রবল হওয়া সত্ত্বেও উন্নত জীবনবোধকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে, উন্নত মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরস্পরের গুণাবলীর স্বীকৃতিস্বরূপ নরনারীর ভালবাসার মহত্ত্বকে দেখাবার ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি নারীচরিত্রটি হিন্দু না মুসলমান এ বিচার করতে বসেন নি। হিন্দু নারীর সঙ্গে মুসলমান কোন পুরুষের হৃদয়ের আদান প্রদান হবে কিনা হওয়া উচিত কিনা এসব সংস্কার আচ্ছাদিত প্রশ্ন তোলেন নি। তাঁর কাছে মানুষ আয়েষাই বড়, তার ধর্ম নয়। অথচ আজ যাঁরা তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে অভিযুক্ত করছেন, সেই তথাকথিত কমিউনিস্ট দলে বহু নেতা আছেন যাঁরা আজও নিজের মেয়ে কোন মুসলিম ছেলেকে ভালবাসলে বিয়ে করতে চাইলে কেবল আঁৎকেই ওঠেন না, বাধাও দেন। প্রগতির হাজারও বুলি চর্চা কিন্তু তাঁদের ওই ন্যূনতম সামন্তী সংস্কাটুকুর হাত থেকে আজও মুক্ত করতে পারেনি।

যদিও বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ছিলেন নৈষ্ঠিক হিন্দু এবং সেই বিশ্বাসে মুসলিমধর্মকে কখনই স্বীকার করেন নি বরং বিরোধিতাই করেছেন, আবার সেই বঙ্কিমচন্দ্রই 'বাংলার কৃষক প্রবন্ধে হাসেম শেখের দুঃখ কত দরদ দিয়ে প্রকাশ করেছেন। 'বাংলার ইতিহাস' প্রবন্ধে লিখেছেন, "রাজা ভিন্ন জাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলা যাইতে পারে না। পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল।... এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাংলার যে রূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।" এ সমস্ত কি তাঁর সাম্প্রদায়িক মনের নজির? বঙ্কিমচন্দ্র বোধকরি বুঝেছিলেন যে সাহিত্যজীবনের প্রথমে তাঁর মনের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ উদারতার যে পরিচয় ছিল, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে গিয়ে পরবর্তী সময় হয়তো তা অনেকাংশে ক্ষীণ হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে মুসলমানদের প্রতি অবিচারও হয়ে গিয়েছে। তাই 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপসংহারে গ্রন্থকারের নিবেদন নাম নিয়ে বলেছেন 'হিন্দু হইলেই ভাল হয় না। মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভালমন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপ আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে

হয় যে যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল।" কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন যে আনন্দমঠের দ্বিতীয় খণ্ডে দশম পরিচ্ছদে কাপ্তেন টমাসের উদ্দেশ্যে ভবানন্দের উক্তি আছে- "কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ?" আবার অন্যত্র তিনি অনেক জায়গায় ইংরাজ রাজত্ব করুক তা চেয়েছেন। "ইংরেজ আগে রাজা না হইলে আর্য্যধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই" প্রভৃতি বলেছেন। একি তাঁর ইংরাজ অনুরাগ এবং মুসলিম বিদ্বেষ নয়? মুসলিম বিরোধিতার প্রশ্নটি আমরা সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

তার নিরিখেই উপরিউক্ত সংলাপটিকেও বুঝতে হবে। ইংরাজ যখন এদেশে আসে তখন মুসলিম নবাব বাদশাহের সঙ্গে বাণিজ্যিক সন্ধি ইত্যাদি স্থাপন করার পথেই তাদের প্রবেশ করতে হয়। ভারতবর্ষের মাটিতে তখন একদিকে মোগল বাদশা আমীর ওমরাহদের শোষণ আর অন্যদিকে সামন্তী কুসংস্কার আচার আচরণ কূপমণ্ডুকতার সীমাহীন প্রাবল্য। ইংরাজ তাঁর ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা এবং রাজ্য শাসনের প্রয়োজনে ভারতীয়দের এই সামন্তী মানসিকতা কাটাবার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলো। আইন জারি করে অনেক কু-প্রথা রহিত করার চেষ্টাও করেছিলো। সাথে সাথে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কিছু কিছু সংস্কারও করেছিলো। শ্রেণী-স্বার্থ থেকে করলেও এর মধ্য দিয়ে শাসক ইংরাজ পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী চিন্তার কিছু কিছু প্রতিফলন সামন্তী অনুশাসন জর্জরিত এদেশের বুকে ঘটিয়েছে। আর এদেখে তখন অনেকেই মনে করেছেন এ হলো সামন্তী অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ। ফলে তাঁরা একে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং ভেবেছেন ইংরাজ শাসন দীর্ঘস্থায়ী হলে দেশের আরও উন্নতি হবে। এ প্রসঙ্গে আরও বুঝতে হবে যে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় এদেশে সাম্রাজ্যবাদী শাসন সম্বন্ধে মানুষের কোন স্বচ্ছ ধারণা জন্মায়নি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে তখন একটা দ্বন্দ্বও ছিল। এই দ্বন্দ্বে স্বাভাবিক কারণেই দীর্ঘদিন ধরে থেকে যাওয়া কোম্পানি শাসনের পরিবর্তে বৃটিশ সাম্রাজ্যবা রাজত্ব করুক, ইউরোপের গণতান্ত্রিক চিন্তা দেশের মাটিতে বাস্তবরূপ নিক এ আকাঙ্ক্ষা অনেকের মতো বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও জেগেছে। জাতীয় স্বাধীনতার রাজনৈতিক চেতনা তখনও কোন বিশেষ রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্বে এক সুসংহত সুস্পষ্ট রূপ নিয়ে দেখা দেয় নি। সবেমাত্র তার জমি তৈরি হচ্ছিল। আমরা জানি যে কোন রাজনৈতিক বিপ্লব আসার পূর্বে তার সাংস্কৃতিক চিন্তাটি সমাজে জন্ম নেয়, বিকাশের পথে ব্যাপ্তি লাভ করে এবং বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টির উপযোগী জনমানস সৃষ্টি করে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগটি এই জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন বা ভারতের মাটিতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হবার পূর্বে তার পরিপূরক সাংস্কৃতিক চিন্তার উন্মেষ অর্থাৎ বুর্জোয়া মানবতাবাদী আন্দোলন সৃষ্টির যুগ। কাজেই এইসময় শিক্ষিত। ব্যক্তিমানস রেনেশাঁসের চিন্তাচেতনার দ্বারা আলোড়িত মন নিয়েই সমস্ত কিছুকে দেখতে চেয়েছে, বিচার করতে চেয়েছে। রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চিন্তার আকাঙ্ক্ষিত প্রকাশ সেই সময়কার শিক্ষিত সমাজ বা রেনেশাঁস ব্যক্তিত্বদের কাছে আশা করা ঠিক নয়। বুর্জোয়া নবজাগরণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ (individualism)-এর আদর্শে বিশ্বাসী হবার কারণে বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরেজ শাসকদের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজকর্মকে ব্যক্তিগত উদ্যম ও প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবেই দেখতে চেয়েছেন। ফলে তার প্রশংসা ইংরাজ ব্যক্তিবিশেষেরই প্রশংসা হিসাবে তিনি ব্যক্ত করেছেন। এই দৃষ্টি থেকেই সামন্তবাদ টিকে থাকার পরিবর্তে বৃটিশ এদেশে রাজত্ব করুক সীমিত অর্থে হলেও তা তিনি চেয়েছেন। তাঁর এই চাওয়াকে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন বলে ভাবলে ভুল হবে। তাই আনন্দমঠে মহাপুরুষের সংলাপ হয়েছে "ইংরেজি শিক্ষায় এ দেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। যতদিন না তা হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান, বলবান হয় ততদিন ইংরেজ রাজত্ব অক্ষয় থাকিবে।... ইংরেজ এক্ষণে বণিক অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনভার লইতে চায় না।" অর্থাৎ ইংরেজ বণিকবৃত্তি ছেড়ে রাজ্যশাসন করুক এবং তার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যের উন্নত চিন্তার সন্ধান দেশবাসী পাক, এটাই ছিল বঙ্কিমের কাম্য। বাদশাহী রাজত্ব বা কোম্পানির লুঠতরাজের বদলে বৃটিশ রাজশক্তি রাজ্য শাসন করুক তা তিনি চেয়েছেন।

আনন্দমঠের পটভূমি - ছদ্মরূপদান

দ্বিতীয়ত আনন্দমঠের পটভূমি রচনা ছিল একটা ছদ্ম রূপদান বা Camouflage। রাশিয়ার বিখ্যাত ভাষ্যতত্ত্ববিদ বনরফের সঙ্গে ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "ইংরেজের বিরুদ্ধে স্পষ্ট করে মতামত দিতে কারও সাহস নেই।" এই উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র পেশায় ছিলেন ইংরাজ শাসনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বক্তব্য বিষয়কে লুকোবার বহু চেষ্টা করলেও আনন্দমঠ প্রকাশের পর তাঁকে রাজরোষে পড়তে হয়। প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজের চাপে পড়ে খানিকটা বাধ্য হয়েই তিনি পরবর্তী সংস্করণগুলিতে অনেক পরিবর্তন ঘটান। "ইংরেজ ভাঙ্গি তেছের" পরিবর্তে "নেড়ে ভাঙ্গিতেছে" লিখে তিনি রাজরোষ থেকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় খণ্ড বিংশতি পরিচ্ছেদে 'যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, ধনবান ও বলবান হয় ততদিন ইংরাজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে" এই বাক্যের পর ২য় সংস্করণে যোগ করেন আরেকটি বাক্য "ইংরেজ রাজে প্রজা সুখী হইবে-নিষ্কণ্টকে ধর্মপরায়ণ হইবে।"

এছাড়া বিংশ পরিচ্ছেদে সত্যানন্দের প্রতি মহাপুরুষের যে উক্তি ছিল- "ব্রত সফল হইবে না - কেন তুমি নিরর্থক নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিতা করিতে চাও?"
দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্তন করে বলা হল- "ব্রত সফল হইয়াছে- মা'র মঙ্গলসাধন করিয়াছ- - ইংরেজ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছ।"
অনুরূপভাবে এই পরিচ্ছেদের অন্যত্র ছিল- "মহাপুরুষ। তুমি আর কিছু করিতে পারিবে না- তোমার দুই বাহু ছিন্ন হইয়াছে- তোমারও আর পরমায়ু নাই।"
দ্বিতীয় সংস্করণে এই সংলাপ পরিবর্তিত হয়ে হলো - "শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজা। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তি কাহারও নাই।"
বলা যেতে পারে, রাজরোষকে অবহেলা করার মতো নৈতিক মনোবল ও সাহস বঙ্কিমচন্দ্রের নাও থাকতে পারে। কিন্তু তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন বা ইংরাজের প্রতি কম বৈরীভাব পোষণ করতেন এ বলতে পারা যাবে কি? ইংরাজের এমন প্রশংসা থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন যে এ বই দেশবাসীকে ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণেই অনুপ্রাণিত করবে। তাই তিনি বলেছিলেন- "যদি সাহিত্যের দ্বারা স্বদেশের মঙ্গলসাধন করা যায় না মনে করতাম তাহলে আমি আনন্দমঠ লিখতাম না। আমার বিশ্বাস আনন্দমঠে এক দিন দেশের উপকারই হবে।" অন্যদিকে ইংরেজও এই উপন্যাসের তাৎপর্য বুঝেছিলো। তাই এর দুর্বলতার দিক অর্থাৎ মুসলিমবিরোধী মনোভাবটিকে গোপনে সুড়সুড়ি দিয়ে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও সংঘবদ্ধতাকে ভাঙ্গতে চেয়েছে। বিভ্রান্ত হয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের কেউ কেউ আনন্দমঠ পুড়িয়েছেন, এও ইতিহাসে আছে। আজও যারা 'বন্দেমাতরম্" শতবার্ষিকীর অন্ধ বিরোধিতা বা অন্ধস্তাবকতায় মত্ত হয়েছেন, তাঁরাও সেই ইংরেজেরই কৌশলে এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে পরোক্ষ উস্কানি দিচ্ছেন না কি? কংগ্রেস বা বিজেপির যদি ইতিহাসের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকত তবে তাঁরা চাইতেন বন্দেমাতরম্ গানের এবং আনন্দমঠের সঠিক যুগভিত্তিক মূল্যায়ন। সেই কষ্টসাধ্য প্রয়াসে যাবার মতো ইচ্ছা অথবা ক্ষমতা কোনটাই যদি তাঁদের না থেকে থাকে তবে আর স্রোতে গা ভাসানো ছাড়া উপায় কি? অন্যদিকে কংগ্রেসের কর্ণধাররাও "বন্দেমাতরমের" অপমান রোখার নাম করে মুসলিম সম্প্রদায়ের একাংশের মনে থেকে যাওয়া বিভ্রান্তিটিকেই আরও প্রবল করে তুলেছেন। যুগভিত্তিক মূল্যায়নে তাঁদেরও ভয় আছে। কারণ তাহলে গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বলতাটি, বিশেষত গান্ধীবাদী নেতৃত্বের আপসকামী চরিত্রটি মানুষ ঠিক ঠিক ধরতে পারবে এবং তাকে কাটিয়ে সঠিক ধর্মনিরপেক্ষতার পথে প্রকৃত অর্থে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ

করার প্রেরণা পাবে। আর তাহলে যে পুঁজিবাদী শাসন টিকিয়ে রাখতে কংগ্রেসের এত আয়োজন, বিজেপির এত ব্যাকুলতা তার ভিতে পড়বে নাড়া।

সঠিক যুগভিত্তিক মূল্যায়নের দিক নির্দেশ

ইতিহাসে ভূমিকা সকলেরই একটা থাকে। বিজেপির আছে, কংগ্রেসের আছে, সাম্প্রদায়িক মুসলিম নেতাদেরও আছে। সেই অনুযায়ী কাজও তাঁরা করে যাচ্ছেন। একদল উগ্র জাতীয়তাবাদের জিগির তুলে, খোলাখুলিভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যুগের সর্বোন্নত মতাদর্শের বিরোধিতা করছে এবং গরম বা নরম সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করছে আর অপরদল মার্কসবাদের নামে মার্কসবাদের বিকৃতি ঘটাচ্ছেন ভেতর থেকে মার্কসবাদী আন্দোলনের কোমর ভেঙ্গে দিচ্ছে। তাঁরা যাই করুন মার্কসবাদী দর্শনের প্রাণসত্তাটি এদেশের বুকে শুধু যে কেবল মূর্ত তাই নয়, যথাযথ প্রয়োগের সূত্র ধরে তা আরও সমৃদ্ধ এবং বিকশিত রূপ পরিগ্রহ করে অন্যান্য বহু বিষয়ের মত এদেশের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন এবং রেনেশাঁস আন্দোলনেরও এক সুনির্দিষ্ট সামগ্রিক যুগভিত্তিক মূল্যায়ন উপস্থিত করেছে। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ তাঁর আমৃত্যু বিপ্লবী জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদকে এ দেশের মাটিতে বিশেষীকৃত করতে গিয়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এক অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা যে অমূল্য শিক্ষাগুলি লাভ করেছি এবং যাকে পাথেয় করেই আজ দেশের অভ্যন্তরে যুগোপযোগী সর্বোন্নত সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠছে তারই আলোকে বিচার করলে উত্থাপিত বিতর্কটিরও যথাযথ সমাধান পাওয়া যাবে এবং বোঝা যাবে কেন আজও বিষয়টি নিয়ে এত বিভ্রান্তি, এত কুযুক্তির অবকাশ রয়ে গেছে। এদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের চরিত্রগত দুর্বলতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদ শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন- "অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্বার্থবোধই গোটা ভারতবর্ষে একটা জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে সমস্ত উপজাতিগুলিকে (nationalities) একসূত্রে বেঁধে ফেলল।··· বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতের সমস্ত উপজাতিগুলি মিলে একটি আধুনিক জাতি গড়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া শুরু হলো গোড়া থেকেই তার মধ্যে কতকগুলো দুর্বলতা থেকে গেল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের কর্মসূচীর মধ্যে সামাজিক বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচীকে মেলাতে সক্ষম না হওয়ার ফলে গোটা nationalities movement-এর (জাতীয় আন্দোলনের) মধ্যে কতকগুলি দুর্বলতা থেকে গেল। Nationalist movement-কে আমরা ধর্মীয় ভাবনা-ধারণা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে সমর্থ হইনি।... Religionকে (ধর্ম) আমরা fight (সংগ্রাম) করিনি। Religion থেকে মুক্ত করে আমরা জাতীয়তা এবং জাতীয়তাবোধের নূতন ভাবধারাগুলিকে সামনে নিয়ে আসতে পারলাম না। ফলে জাতীয়তাবাদ মূলত religion oriented nationalism (ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ) হয়ে পড়ল এবং এরূপ অবস্থায় অতি স্বাভাবিকভাবেই এই আন্দোলনে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য থেকে গেল। স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিলেন গণতান্ত্রিক ভাবনা ধারণার কথা যত সুন্দর করেই তাঁরা বলুন না কেন, এই কারণেই ভারতবর্ষের মুসলমানদের তা স্পর্শ করতে পারল না। কারণ জাতীয় মানসিকতার এই জট ছাড়াবার জন্য দেশের এই কূপমণ্ডুকতা এবং সামন্ততান্ত্রিক বিভেদ ও ভাবধারাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে... স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে রাজনৈতিক বিপ্লবের কর্মসূচীকে incorporate করা (অন্তর্ভুক্ত করা) সর্বপ্রথম জরুরী কাজ ছিল... জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে ঝাণ্ডাটি রাজনৈতিক নেতারা রাজনৈতিক বিপ্লবের তাড়াহুড়োয় অবহেলায় ফেলে দিলেন গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী ও মেকী সাম্যবাদীরা ভোটের রাজনীতিতে অসুবিধা হতে পারে এই ভয়ে আজও অবহেলায় ফেলে রেখেছেন, অবহেলায় ভূলুণ্ঠিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের

সেই ঝাণ্ডাটিকে আজ আপনাদের উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে এবং ক্রমাগত জ্ঞানের আলোকে তাকে আরও উদ্ভাসিত করতে হবে। এইভাবে বিশুদ্ধ সংস্কৃতিচর্চা ও সর্বপ্রকার বুর্জোয়া ভাবধারার আক্রমণকে প্রতিহত করে আপনারা যদি এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে স্তরে স্তরে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সর্বহারা বিপ্লবের পরিপূরক দেশে একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেন তবেই জাতীয় জীবনে আজ যে নৈতিকতার সঙ্কট সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আজ যে জড়তা তা দূর হবে" (ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য)।

যখন সুযোগ সন্ধানী নানা মহল নানা সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইতিহাসকে বিকৃত করতে চাইছে, কখনো রামমন্দির, কখনো গোধরাকাণ্ড, কখনো বন্দেমাতরম্ ইত্যাদি প্রশ্নে সাম্প্রদায়িকতা খুঁচিয়ে তুলছে তখন এই অমূল্য বিশ্লেষণ এবং যথাযথ দিকনির্দেশই আমাদের সত্যানুসন্ধানের একমাত্র হাতিয়ার।